25 APR 2017

চিকিৎসায় উচ্চশিক্ষার ভরসাস্থল

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী | **অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান**

উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার চলমান স্বর্ণযুগের অন্যতম অবদান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে এটি দেশের মানুষের চিকিৎসা ও উচ্চ মেডিকেল শিক্ষার অন্যতম ভরসাস্থল।

দেশের চিকিৎসক সমাজের তিন দশকের দাবি ছিল একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের। অনেক সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিন্তু বাস্তবায়নে কোনো পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি। জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে সে দাবি আবার উত্থাপিত হয় ১৯৯৭ সালে। জাতীয় অধ্যাপক নূরুল ইসলামের (প্রয়াত) নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালের ২০ জুলাই দেশের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গটি এসে যায়। প্রধানমন্ত্রী দেশে একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যৌক্তিকতায় সম্মতি দেন। পরদিন তৎকালীন আইপিজিএমআরের পরিচালক অধ্যাপক মো. তাহির তৎকালীন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মো. মোয়াজ্জেম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমাকে ডেকে সরকারের কাছে একটি আবেদন করার কথা বলেন।

১৯৯৭ সালের ২৪ জুলাই আমরা আইপিজিএমআর শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে তৎকালীন স্বাস্থ্য সচিব মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি আবেদনপত্র হস্তান্তর করি। মানুষের জীবনে কিছু ঘটনা সারাজীবন আবেগময় ও প্রচণ্ড অনুভূতিপ্রবণ করে রাখে। সে দিনের সে ঘটনাও আমার জীবনে তাই। দেশের প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ড্রাফটটি করার বিরল সৌভাগ্য হয়েছিল এবং এর নামকরণেও আমার ভূমিকা ছিল। জাতির পিতার নামে হবে– এটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল, কিন্তু জাতির জনকের নামটি কীভাবে হবে সেটি নির্ধারণ করার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। আমি অনেক ভেবেচিন্তে নামটুকু নির্ধারণ করেছিলাম।

আমরা আবেদনের বিষয়টি নিয়ে চুপচাপ ছিলাম। ১৯৯৭ সালের ২৩ জুন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল, নেতৃবৃন্দ যেন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

৩১ জুলাই ১৯৯৭, বিটিভির রাত ৮টার খবর দেখছিলাম। হঠাৎ ঘোষণা– সরকার আইপিজিএমআরকে রূপান্তর করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আমি বিস্মিত হয়েছিলাম ভেবে, মাত্র সাত দিনের ব্যবধানে এ রকম একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত, যা তিন দশকের অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম-প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে হয়নি। চিকিৎসকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

পরদিন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণির নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারী এর বিরোধিতা শুরু করেন। তাদের বক্তব্য ছিল– এতে তারা চাকরিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও এর বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে সব শিক্ষক ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন কিছু সংখ্যক নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারী। প্রতিদিন ক্যাম্পাসে পাল্টাপাল্টি সভা-সমাবেশ, মিছিল এমনকি বিরোধীদের পক্ষে ঘেরাও কর্মসূচিও পালিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন ইউসুফ (প্রয়াত) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি প্রায় প্রতিদিনই আমাদের সঙ্গে বসতেন। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন বিএমএর তৎকালীন মহাসচিব ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন। দীর্ঘ সাত-আট মাস এ আন্দোলন আমাদের প্রতিহত করতে

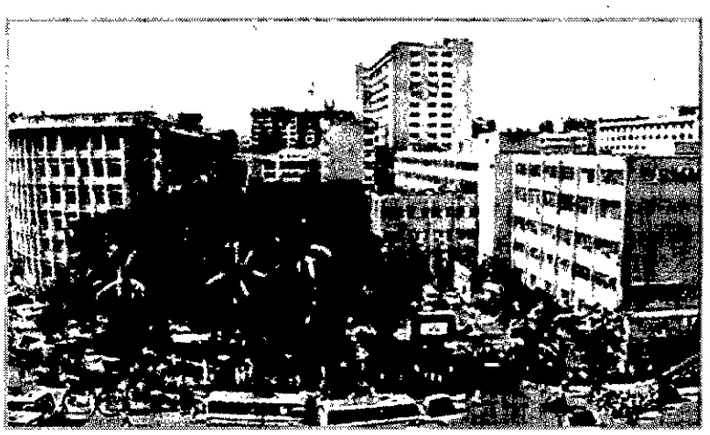

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনসমূহ

হয়েছিল।

একদিকে আন্দোলন-ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে দিনরাত, অন্যদিকে বিএমএর পক্ষ থেকে খসড়া আইন প্রস্তুতির বিশাল কর্মযজ্ঞ। বিএমএর পক্ষ থেকে '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশকে অনুসরণ করে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯৮ খসড়া' সরকারের কাছে উপস্থাপন করা হয়। এ প্রস্তাবসহ আরও কয়েকটি আইন দেখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯৮ মহান সংসদে অনুমোদিত হয়ে ৫ এপ্রিল ১৯৯৮ তারিখে গেজেট হিসেবে প্রকাশিত হয়। এখানেও আমার একটি বিশেষ অনুভূতির বিষয় রয়েছে। সংসদে যে খসড়াটি বিতরণ করা হয়, তার মুখবন্ধটি আমার লেখার সুযোগ হয়েছিল।

অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ১৯৯৮ সালের ৩০ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয় প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এমএ কাদেরীর মাধ্যমে।

কেন আমরা বিশ্ববিদ্যালয় চেয়েছিলাম? দেশে মেডিকেল শিক্ষা তিন প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভর্তি নীতিমালা ও পরীক্ষা, ছাত্র ভর্তি, শিক্ষক নিয়োগ ও বদলি এবং শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। কোর্স কারিকুলাম তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল। একাডেমিক কারিকুলাম, পরীক্ষা পরিচালনা ও সনদ প্রদান করে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়। ওপরের ত্রয়ী নিয়ন্ত্রণে যেসব কাজ সম্পাদিত হচ্ছে, তা বিশ্বে প্রচলিত ধারা অনুযায়ী এককভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। সে কারণে আমরা চেয়েছিলাম, দেশের সব মেডিকেল প্রতিষ্ঠানকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তকরণ। তখন সবটা হয়নি, কিন্তু এখন ধাপে ধাপে সবই হচ্ছে। আরও দুটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে। সেখানে আমাদের লক্ষ্য আরও এক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে।

২০০১ সালের ১ অক্টোবর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে নেমে আসে এক গভীর সংকট। সারাদেশের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ও আক্রমণের শিকার হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের যত জায়গায় জাতির পিতার নাম লেখা ছিল, সব জায়গায় রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতকারীরা কালি লেপন করে দেয়। এমনকি আমাদের প্রাণপ্রিয় ম্যুরালটি ভেঙে ফেলে।

তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল– বিশ্ববিদ্যালয়কে আইপিজিএমআরে ফিরিয়ে নেওয়ার। আমরা প্রতিদিন সভা-সমাবেশ, মিছিলের মাধ্যমে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুললাম। বিশ্ববিদ্যালয় অন্য কোথাও সরে যায়নি বা আইপিজিএমআরে ফিরেও যায়নি। সবই সম্ভব হয়েছিল আমাদের সমমনাদের ঐক্যবদ্ধ কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে।

কিন্তু তখন চলেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে সব অনিয়ম আর দুর্নীতি। ভর্তি পরীক্ষায় অনিয়ম, লোক নিয়োগে অনিয়ম, রেসিডেন্সি বাতিল করে সনাতনী কোর্সে ফিরে যাওয়া, অবৈধ শিক্ষক নিয়োগ-পদোন্নতি, টেন্ডারে দুর্নীতি ইত্যাদি। হারিয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অর্জন, মানুষের আস্থা এবং প্রশ্নবিদ্ধ হয় উচ্চ মেডিকেল শিক্ষা।

২০০৯ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা আবার নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতার দায়িত্ব পাওয়ায় ফিরে এলো আবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ। পুনঃপ্রবর্তিত হলো উচ্চশিক্ষার রেসিডেন্সি কোর্স। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্ত করলেন একনেকের মাধ্যমে ৫২৫ কোটি টাকার Centre for Excellence Phase II-এর প্রকল্প, অটিজম শিশুদের চিকিৎসার প্রাণকেন্দ্র, বারো বিঘা জমি, শাহবাগের পুরনো বেতার ভবনের জমি, গ্র্যাজুয়েট নার্সিং ইনস্টিটিউটসহ অনেক নতুন পরিকল্পনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আবার উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে নিয়োজিত হলেন উন্নতমানের মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিনির্মাণে। কাদেরী স্যারের পরে বিভিন্ন সময়ে অধ্যাপক মাহমুদ হাসান, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম এবং অধ্যাপক প্রাণ গোপাল দত্ত তাদের সাধ্যমতো বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

আমি ২০১৫-এর ২৪ মার্চ উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় দেশে-বিদেশে সমাদৃত, মানুষের আস্থা ও ভরসার স্থল। এ কারণেই গত ডিসেম্বরে বিশ্বসেরা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্মত চিকিৎসা ও গবেষণা কার্যক্রমের জন্য। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে স্পেনের সিমাগো রিসার্চ গ্রুপ ও যুক্তরাষ্ট্রের স্কপাস পরিচালিত জরিপে দেশে পঞ্চম এবং বিশ্বে ৬৪০তম অবস্থানে স্থান পায় দেশের একমাত্র এই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। জরিপে দেখা যায়, ভারতের একটি ইনস্টিটিউট এগিয়ে থাকলেও পিছিয়ে আছে অন্য সব চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার সমগ্র জীবনে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা, পারিবারিক জীবন ত্যাগ করে শুধু চেয়েছেন বাঙালির স্বাধীনতা এবং সুখী-সমৃদ্ধ জীবন। আমরা যারা তার নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি, আমাদের কোনো ত্যাগ করতে হবে না। শুধু আমাদের নিজ নিজ দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি। আমরা সবাই মিলে জাতির পিতার নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের মানুষের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান এবং বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসক তৈরিতে বদ্ধপরিকর– এটাই হোক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২০তম দিবসের অঙ্গীকার।